45

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা ও কতিপয় সমস্যা

পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থাই তাদের উন্নতির কারণ। সেখানে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা জাতির জন্য হতাশা ছাড়া আর কিছুই দিচ্ছে না। এ হতাশা কি মেডিকেল, কি ইঞ্জিনিয়ারিং, কি বিশ্ববিদ্যালয়– সকল ছাত্রের ক্ষেত্রে একই। এমনিতে উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থায় তিন-চার বছর বেশী লাগে। তারপর আবার চাকরিজনিত সমস্যা। এতদ্বিধ সমস্যা তত্ত্বীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রদেরকে তো বটেই– বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রদেরকেও হতাশাগ্রস্ত করেছে এবং করছে। এটা সত্যই দুঃখজনক। শিক্ষাব্যবস্থায় অন্যান্য, জাতি যেখানে এগিয়ে চলছে সেখানে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি।

শিক্ষাব্যবস্থায় এ স্থবিরতা জাতির জন্য এখন দুঃশ্চিন্তার বিষয় এবং এর সুষ্ঠু সমাধান সর্বাগ্রে দরকার। নতুবা জাতীয় উন্নয়নের কল্পনা করা এবং ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা বাতুলতা মাত্র।

এখন দেখা যাক শিক্ষাব্যবস্থায় এ স্থবিরতার কারণ কি?

প্রথমতঃ আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাও বর্তমানে সেশনজটে ভুগছে। এর আগে দেখা যেত মাধ্যমিক পরীক্ষা মার্চ বা এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন সেটা মে-জুন-এ চলে গেছে। ফলে রেজাল্ট-এ বিলম্বতা ও দেরীতে কলেজ ভর্তি, একই অবস্থা চলছে উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রেও– ফল একই বিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় সাবসিডিয়ারী বা চতুর্থ বিষয় সংযোজন। ফলস্বরূপ দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা পদ্ধতি। বিষয়টাকে একটু পরিষ্কার করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯১-৯২ সেশনের বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান অনুষদের দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার নমুনা তুলে দিচ্ছি–

বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের পরীক্ষা শুরু হয় '৯৩ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে। অনার্সের বিষয়ের তত্ত্বীয় পরীক্ষাসহ প্রাকটিক্যাল শেষ হয় জানুয়ারী মাসে। অনেকের অবশ্য ফেব্রুয়ারীতে। তারপর থেকে যায় সাবসিডিয়ারী বা চতুর্থ বিষয়ের ঝামেলা। সাবসিডিয়ারী বিষয়ের পরীক্ষা শুরু হয় মার্চের প্রথমে এবং শেষ হতে পুরো এপ্রিল মাস লেগে যায়।

সাধারণত অনার্স বিষয়ের পরীক্ষা শেষে চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষার তারিখ ধার্য করা হয়। এক বিভাগের অনার্সের ছাত্র সাবসিডিয়ারী বিষয়ের ক্ষেত্রে অন্য বিভাগের সাথে যুক্ত। পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ ঐ বিভাগের নিজস্ব এখতিয়ারে। ফলে চতুর্থ বিষয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত নতুন বর্ষের ক্লাস শুরু হয় না।

তৃতীয়তঃ শিক্ষক স্বল্পতার কারণে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত নির্ধারিত তারিখে কোন ডিপার্টমেন্টের ক্লাস শেষ হয় না।

চতুর্থতঃ বিলম্বে পরীক্ষার ফল প্রকাশ। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পরীক্ষা শেষ হওয়ার তিন কিম্বা চার মাস পর রেজাল্ট দেয়।

ফলতঃ দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষা শেষ হতে চার মাস ও ফল প্রকাশ করতে তিন মাস– মোটের উপর ৬ থেকে ৭ মাস লাগে প্রতি সেশনের পরীক্ষা শেষ করতে। সুতরাং দেখা যায়, ৮ মাস ও ৭ মাস পরীক্ষা প্রক্রিয়া দিয়ে প্রায় পনের থেকে ষোল মাস লাগে একটি পর্ব বা বর্ষ শেষ করতে।

পঞ্চমতঃ অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, জাতীয় রাজনীতি এদেশের ছাত্র সমাজই নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় স্বার্থে ছাত্রদেরকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। ফলে, ছাত্ররা হয়ে পড়ে দ্বিধা-বিভক্ত। দেখা দেয় চর দখলের মত হল দখল ও ক্যাম্পাস দখলের মত ঘটনা। ফলস্বরূপ পবিত্র শিক্ষাঙ্গন হয় রক্তাক্ত– অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।

শিক্ষাব্যবস্থায় স্থবিরতা ও ছাত্রদের মধ্যে হতাশার জন্য সেশনজট দায়ী। আর সেশনজটকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং গতিশীল করে উপরোক্ত কারণগুলো। যার ফলে শিক্ষা নামক এ জাতির জাতীয় মেরুদন্ডটিই ভাঙ্গতে বসেছে। এর প্রতিকার হওয়া জরুরী।

মূলতঃ শিক্ষাব্যবস্থায় এ কতিপয় সমস্যার মূলোৎপাটন কোন বিরাট ব্যাপার নয়। শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতাই যথেষ্ট। নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করলেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

এক ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতি গতিশীল ও সময়োপযোগী করা। কোনক্রমেই ছাত্রদের চাপের মুখে পরীক্ষা পিছানো উচিত নয়।

দুই ঃ উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থায় সাবসিডিয়ারী বা চতুর্থ বিষয় উচ্ছেদ। কেননা চতুর্থ বিষয় যে কারণে সংযোজন করা হয়েছিল তা বর্তমানে অর্থহীন। মান্ধাতার আমলের এ পদ্ধতির মূলোৎপাটন অতীব জরুরী। প্রয়োজনবোধে অনার্স বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সাবসিডিয়ারী বিষয়গুলোকে অনার্সের মত আবশ্যক বা এক করে দেয়া। নতুবা সেশনজটের চাকা যেভাবে গড়াচ্ছে তাতে চার বছরের কোর্স শেষ করতে হয়তোবা দশ বছরও লাগতে পারে।

তিন ঃ শিক্ষাব্যবস্থাকে গতিশীল করার জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করা। প্রায়শঃ দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োজিত নতুন শিক্ষক উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। তাদেরকে অনেক লম্বা শিক্ষা-ছুটি দেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তারা আর দেশে ফিরতে চায় না। ফলে প্রতিটি বিভাগই শিক্ষক সমস্যায় ভোগে। এক্ষেত্রে অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাইরে অবস্থানরত শিক্ষকদেরকে দেশে ফিরতে বাধ্য করা উচিত।

চার ঃ পরীক্ষা প্রক্রিয়াকে পরিমার্জন ও দ্রুত ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করা। ইনকোর্স ও বার্ষিক পরীক্ষা পদ্ধতিকে বাতিল করে সেমিষ্টার-পরীক্ষা পদ্ধতি করা যেতে পারে।

পাঁচ ঃ ছাত্রদের পরীক্ষা পিছানোর প্রবণতা দূরীকরণ ও নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স শেষ করার জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা।

আশার কথা এই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম এ ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। কিন্তু সেটাও ঠিকমত বাস্তবায়িত হয়নি। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী '৯২-৯৩ সেশনের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ৮ এপ্রিল। কিন্তু সেটাও পিছিয়ে শেষ পর্যন্ত ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হলো– এটা কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা ও দায়িত্বহীনতারই পরিচায়ক। অবশ্য কর্তৃপক্ষ 'ডাকসু'-কে কারণ হিসাবে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা পিছালো ঠিকই কিন্তু ডাকসু নির্বাচন হলো না।

ছয় ঃ ছাত্রদের হতাশা দূরীকরণ ও কর্মের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এজন্য উন্নত বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার মত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রবর্তিত করা যেতে পারে। প্রতি পর্ব বা বর্ষ ক্লাস ও পরীক্ষাসহ ৯ মাসে শেষ করা এবং অবশিষ্ট ৩ মাস বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ফলস্বরূপ জাতি সুশিক্ষিতের পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তিও পাবে।

সাত ঃ ছাত্র সংঘর্ষের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন বন্ধ না হয় সে জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা অথবা জাতীয় রাজনীতির লেজুড় হিসাবে ছাত্র রাজনীতিকে জড়িত না করা। ছাত্র রাজনীতি শুধুমাত্র ছাত্রদের সমস্যা সমাধানের জন্যই হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য দরকার।

সবচেয়ে স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হলো– যে কোন জাতি, প্রাকৃতিক সম্পদ যতই থাক– সিংহভাগ শিক্ষিত না হলে কখনও তাদের জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ জন্য জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাজমান সমস্যাকে মূলোৎপাটন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার।

সৈকত মজিদ